Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 133 - 140
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 133 - 140
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

অনিতা অগ্নিহোত্রীর নির্বাচিত ছোটগল্প : প্রান্তিক জীবনের মরমী উপাখ্যান

সুস্মিতা সেন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: sushmitasen200@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Geographical, central, survive, regions, rural, injustice.

Abstract
The short story is one of the most modern branch of Bengali Literature and one of the art forms of creative prose. Since its birth, this branch of literature has gradually spread beyond the borders of the country and time by collecting material from within the known geographical limits. Literary Anita Agnihotri herself has traveled to different parts of East and central and northern Odisha came close to the marginal people. She has given shape to the story of the life of the people there, the story of their constant struggle for survival in daily life their. She was able to realize very closely the reality of the marginal society living close to the soil. The various crises of society, the lack of hunger, the life of marginal people and social injustice has beautifully shown in Anita Agnihotri's writing. The writer has planted one seed in the form of stories while talking about the diffrent regions and different people of India, their lifestyle, language manners, and various short comings of livings. The basis of all these stories in mainly about the environment, nature and people outside Bengal. Village, urban underclasses, water bodies, rivers, forests and lost township and their pathetic stories emerge in Anita Agnihotri's stories.

Discussion

অনিতা অগ্নিহোত্রী তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য জীবনে বারবার মানুষের কথা বলেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে মানুষকে দেখেছেন নদী, পাহাড়, ধুলোমাখা ঘর-বসতের নানা স্বপ্নদৃশ্যের প্রেক্ষাপটে। গল্পের কাহিনী ও চরিত্র আমাদের চেনা জগতের, সহজ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 133 - 140
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভাষার, পরিচিত জীবনের অন্তর ও অন্দরের সত্য উদঘাটন করে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উপস্থাপিত করে। লেখিকার গল্পে পাওয়া না পাওয়া, দারিদ্র্য-স্বচ্ছলতা, আনন্দ-বেদনা, আলো-অন্ধকার, ভালো-মন্দ অনেক কিছুরই রূপায়ণ চোখে পড়ে তবু লেখকের সৃষ্টিকর্মের সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় নেতির হতাশায় নয়, ইতির ইঙ্গিতে। পৃথিবীতে প্রার্থিত শান্তির বাণী শুনিয়েছেন তিনি তাঁর রচনাসমূহের আঙ্গিকে। তাঁর বিশ্বাস জীর্ণ জীবনের ডালপালা ধরেই একদিন মানবাত্মার মুক্তি ঘটবে। প্রকৃতির অফুরান সৌন্দর্যের অপমৃত্যু দেখে যেমন ব্যথিত হয়েছেন তেমনই আবার অসমবন্টিত সুযোগ-সুবিধার প্রভাব প্রান্তিক জীবনে কিভাবে পড়েছে তা সুনিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি তাঁর লেখায়। অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখায় শুধু কল্পনা বিলাসই নয় বরং সাহিত্যের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে মানবজীবনের নকশাচিত্র। দৃশ্যমান জীবনের চাকচিক্যময়তার উল্টোপিঠে ছড়িয়ে আছে যে জীবন, সেই জীবনের বহুদূরব্যাপ্ত অববাহিকার চিত্র ধরা পড়েছে বিভিন্ন গল্পগুলোতে। সেই দৃশ্যপট কোন সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এ যেন গল্পের কাহিনী নয়, অখণ্ড ভারতবর্ষের বাস্তব জীবনচিত্র। ভাবতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ও বিবিধ মানুষ, তাদের জীবনচর্যা, ভাষা-ভঙ্গি, জীবনযাপনের নানা অভাব-অভিযোগের কথা বলতে গিয়ে লেখিকা গল্পের আকারে এক একটি বীজ রোপন করে গেছেন। এই সকল গল্পের ভিত্তিভূমি মূলত বাংলার বাইরের পরিবেশ প্রকৃতি ও জনমানসকে নিয়ে। গ্রাম-গঞ্জ, শহরের নিম্নবর্গীয় মানুষ, জলাশয়, নদী, অরণ্য ও হারিয়ে যাওয়া জনপদ ও তাদের কথন অনিতা অগ্নিহোত্রীর গল্পে উঠে এসেছে। বাস্তবতার মাটিতে প্রতিনিয়ত লড়াই ও সংগ্রাম করে টিকে থাকার প্রবণতা, সম্পর্কের বেড়াজাল ভেঙে আপন মানুষের দূরে চলে যাওয়া যেন স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা নিয়ে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে সুনিপুণভাবে ফুটে উঠেছে লেখিকার লেখনীতে। প্রান্তিক জনজীবন নিয়ে লিখতে গিয়ে লেখিকা বলেছেন-

> "সে দেশের মাটির গন্ধ, নদীর কলস্বর, হলুদ প্রজাপতির জীবনকাল, কুয়াশা, গাছপালা আর জীবনকে ভালোবেসে মাটিতে শিকড় নামানো মানুষজন তাকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় নতুন সব অন্যরকম কাহিনী। শহরের ভিতরেও আছে লুকোনো নানা শিরা-উপশিরা- দিনের আলোয় তারা স্পষ্ট নয়। তাদের মনের ভিতর নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে হয় বারবার।"[১]

আত্মকথনের ভঙ্গিতে প্রতিভাসিত তাঁর অন্তরের কথাগুলোই লেখনীতে প্রান্তিক জীবন চর্যার জীবন্ত দলিলে রূপায়িত হয়েছে।

অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা 'প্রত্নবিষাদ ও জল' গল্পে দক্ষিণের মালভূমি, নদ-নদী ও তৎসংলগ্ন মানুষের জীবনযাত্রার সূচারু রূপ ফুটে উঠেছে। গল্পের প্রেক্ষাপটে নদীর উৎস অবস্থান, ভৌগোলিক তথ্য ও প্রান্তিক জীবনচর্চার একাধিক দিক বেশ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। হারিয়ে যাওয়া জনপদ, অরণ্য ও প্রাচীন স্থাপত্যকে বাঁচিয়ে রাখার প্রবণতার মধ্য দিয়ে তৎসংলগ্ন জনজীবনের দুঃসহ দৈনন্দিন জীবনযাপনের কথা আমাদের পাঠকমহলকে ভাবিয়ে তোলে। গল্পে আমরা প্রাগুক্ত ঘটনার পরিচয় পাই। গল্পের প্রেক্ষাপট সুনবেড়া মালভূমির চন্দনমহল অঞ্চল। চন্দনমহলের ঢিবির আঙ্কাটোলি জঙ্গনদীর ধারে প্রাচীন স্থাপত্যের সন্ধান মেলে, অনেক শতাব্দী আগের হারিয়ে যাওয়া জনপদের অতীত ঐতিহ্য সন্ধানে মহানদীর উৎস। পশ্চিমে ওয়েনগঙ্গার উপত্যকা থেকে পূর্বে জন্তনদী, আর এর মধ্যবর্তী অঞ্চল ছিল মহাকোমল। খননকার্যের ফলে মহাকোমল সাম্রাজ্য উত্থিত হয়। বাঁধের জলাধার টইটুম্বুর হয়ে পড়ে, শোনা যায় মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারে সমগ্র এলাকা। সুধাময়ের নেতৃত্বে খননকার্য চলছে। সুধাময়-এর নেতৃত্বে পিচার-বুড়ার দলবল প্রত্নপ্রাচীর স্থাপত্যের সন্ধানকার্য শুরু হল বাস্তুচ্যুত হতে দেখা যায় গ্রামবাসীদের। আঙ্কাটোলি, রমনাগুড়া, তেলিভাসা এইসব গ্রামের মানুষরা ঘর ছেড়ে নতুন জমির সন্ধান করতে লাগে। শহর থেকে আসা সুধাময় সোনা খুঁজছে শহরে নিয়ে যাবে বলে, খননের ফলে মাটির তলা থেকে ওঠা ইট, মৃৎপাত্রের টুকরো, মূর্তি, ছোট ছোট পাতলা সোনার চাকতি, গোমদ জাতীয় পাথর এর পাশাপাশি রটে যায় জল উঠে এসেছে গ্রামাঞ্চল জুড়ে। লোকমুখে প্রচারিত হয়েছে নদীবাঁধ ভেঙে গিয়ে জলের সশস্ত্র পায়ের শব্দে মাটির শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে বিদ্যুৎ সংকেত। পাথরকুয়ো চত্বরে বসে আলোচনা চলে এরূপ-

> "সব ডুবে যাবে, এই সব কিছু... মাটির নীচ থেকে তিল তিল করে বার করে আনা মহাকোশলের রাজধানী ...ডুবে যাবে জলে।"[২]

এসব অনেক দিন পরের আসন্ন ঘটনা, ঘর ছেড়ে চলে যেতে দেখা একের পর এক বসত দেখে সুধাময়ের বুকের ভেতরটা পাথরের মতন চেপে আসে। চারিদিকের মাঠ-বন, তোলপাড় করে উঠে এসে ব্যথিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা- "সুধাময় আমাদের

বাঁচাবে তো? জল আসার আগে নিয়ে যাবে তো আমাদের?"[৩] এই প্রশ্ন যেন বন, মাঠ ঘাটের নয়, এ তো তৎসংলগ্ন জনজীবনেরই আর্তি। কয়েকদিন আগে সুধাময় আঙ্কাটোলির পুরনো, পরিত্যক্ত পাড়ায় গিয়ে বৃষ্টিতে আটকে পড়েছিল, যা ছিল এক সময়ে লোকজনের ভীড়ে জমজমাট। জল আসবে এই হল্লায় কতবছর হল মানুষ ঘর ছাড়তে আরম্ভ করে। জলাধারের পেটের ভেতরে অবস্থিত ঐ সব এলাকার মানুষ আস্তে আস্তে জমি, জঙ্গল ও নতুন রুজির সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। এক সময় ঐ ছত্তিশগড় এর গ্রামগুলি ছিল মানুষের কোলাহলে জমজমাট। প্রান্তিক নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর নিত্যদিনের জীবনযাপনের চিত্র ধরা পড়েছে এরূপ- গোন্ড, ভুঞ্জিয়া, পহরিয়া বেশির ভাগ এরাই থাকে আশপাশের এই ছ-সাতটা গাঁয়ে। একদা পহরিয়াদের মূলবৃত্তি ছিল কামারের, এখন তারা বাঁশের কাজ করে। ভুঞ্জিয়াদের মধ্যে আবার দুটো শ্রেণী 'চিন্দা'রা চাষী আর 'চিটিয়া'রা পাহাড়ের ঢালে ঝুম চাষ করে অথবা শিকার। গোত্রা হল গোয়ালা। এইসব সমাজের লোকেরা আজ স্বগৃহ ছেড়ে নতুন বসতি স্থাপন করেছে দূরে। আর তাতে জমি জায়গার দামও দাবানলের মতো হুহু করে বাড়তে থাকে। উনিশশো তেতাল্লিশের অজন্মা, ছেষট্টির দুর্ভিক্ষের পর মানুষজন স্বৈরিণী নদীর কোমরে বেড়ি পরালে সার্ভের তোড়জোড়ে যখন উপত্যকা অঞ্চলে মাটি খোড়া শুরু হয় তখন স্বাভাবিক ভাবেই বাস্তুচ্যুত হতে হয় সাধারণ মানুষকেই। গোপন খননকার্যে জনমজুররা চাপা পড়ে। ফেরার হয় ভিনদেশী ব্যবসাদার। গ্রামবাসীর মধ্যে একজন সহদেব ঘর ছেড়ে চলে গিয়ে নতুন গাঁয়ে জমি কিনে ঘরদোর করে বসত করলেও এখনও বাপ-পিতা মোর বাস্তুভিটে ঘুরে ফিরে দেখে সে। গরু চড়াতে এসে একরকম মোহের টান তাকে বারে বারে টেনে নিয়ে আসে সহদেবকে শূন্য পাড়ায়। লরিয়া বুলিতে আনমনে ওর সজল উদাস চোখ সুধাময়বাবুকে বলে চলে-

> "মে, ইগাঁ ছোড় দেই। হুজুর ইহর মোর ঘর রহিস, ইহর মোর পুরখা বাপমাকে ভিটামাটি রহিস, নওয়া গানে রহেবার মোর মন নি লাগথে।"[৫]

প্রকৃতিকে ভালোবেসে, প্রাকৃতিক সম্পদের আভরণে বেঁচে থাকা, বেড়ে ওঠা প্রান্তিক জনজীবনের বাস্তুচ্যুত হয়ে ওঠার ট্র্যাজিক বর্ণনা গল্পে সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন অনিতা অগ্নিহোত্রী। গল্পে দেখানো হয়েছে একদিকে শহরের বাবু সুধাময়কে কেন্দ্র করে সোনা খননের কাজ চলছে আর তাতে প্রাকৃতিক সম্পদে টান পড়েছে, ব্যাহত হয়েছে স্বাভাবিক জনজীবন। এই প্রান্তিক জীবনের সংকটের ছবি গল্পে লেখিকা যতটা আন্তরিকভাবে দেখিয়েছেন পাশাপাশি সুধাময় চরিত্রটির মধ্যেও নানা প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করার দৃঢ় প্রত্যয়ের দিকটি তুলে ধরেছেন। চাকরি না থাকার দিনে রুমা সুধাময়কে ছেড়ে চলে যায়, সেই স্থান পূরণ করে দেয় পরবর্তীকালে প্রতিমা। মায়ের শারীরিক অপ্রতিকূলতায় তাদের কোলে আসে বিকলাঙ্গ সন্তান। প্রতিমার অলঙ্কার বিক্রি করে জীবনযাপন করেও জীবনরূপ গোলক ধাঁধার রহস্য ভেদ করতে পারেননি সুধাময়। লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন সুধাময়ের জীবনও ঐ প্রত্ন পাথরগুলির মতোই অথবা আঙ্কটোলির মতনই তুমুল জলমগ্ন সুধাময়ের ভবিষ্যৎ। সুধাময়ের জীবন কাহিনীর বর্ণনার পাশাপাশি গল্পের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে প্রান্তিক জনজীবনের আচার, সংস্কৃতি, লৌকিক বিশ্বাসের চিত্র, অর্জুনগাছের তলায় গ্রামদেবতার পূজার কথা জানা যায় গোপালক সহদেবের বর্ণনা থেকে। উপত্যকা অঞ্চলের জনজীবনে প্রচলিত নানা ধর্মীয়, লৌকিক উৎসবের কথা থেকে জানা যায়। চৈত্র পরব, নুয়াখাই, করমাপূজার প্রসঙ্গ প্রান্তিক জীবনের আখ্যানকে পূর্ণতা দান করেছে অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'প্রত্নবিষাদ ও জল' নামক শীর্ষক গল্পটি।

ছত্তিশগড়ের প্রান্তিক মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের কথা ব্যক্ত হয়েছে 'নবান্ন' গল্পে। জঙ্গলাকীর্ণ ঢেউ খেলানো মালভূমি অঞ্চল পারলাখেমুন্ডির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীপথ ও জনজীবনের আখ্যান গল্পে সুনিপুনভাবে উঠে এসেছে। গল্পে দেখা যায় কুসুমজোর, কসাইপালি, নুয়াগুড়া, কেন্দুমুন্ডা গ্রাম নতুন ধানের উৎসব নবান্নে মেতে উঠবে। উৎসবের আগেই সুদূর আমেরিকার কোস্টারিকা নামক ছোট দেশ থেকে মার্গারিটা ভেলাকোয়েজ গবেষণার কাজে কুসুমজোর গ্রামে আসে। অধ্যাপক দীনশঙ্করের তত্ত্বাবধানে তাঁর 'নৃতত্ত্ব আর অর্থনীতি' নিয়ে গবেষণার সূত্রে কুসুমজোর ও তার সীমান্তবর্তী এলাকার অনাহার ও অপুষ্টির শিকার হওয়া প্রান্তিক জনজীবনের কথা গল্পে অত্যন্ত সহজ, সরলভাবে ব্যক্ত হয়। গ্রামের প্রধান নিখিলের ওপর দায়িত্ব পড়ে মার্গারিটাকে প্রান্তিক অঞ্চল ঘুরিয়ে দেখিয়ে তথ্য সংগ্রহ করানোর। মার্গারিটার গবেষণাকর্মে সুনাবেড়া, সোনপুরের মহানদীর পার্শ্বস্থিত মানুষদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সেখানকার প্রকৃতি পরিবেশ,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 133 - 140
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দৈনন্দিন জীবনচর্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ফুটে ওঠে। উত্তর ও মধ্য প্রদেশের অরণ্যসংকুল পার্বত্য এলাকা ঘেষা জনমানবের অভাব-অনটন আর শোষণের প্রাবল্য যে কতখানি তা মার্গারিটাকে দেওয়া নিখিল মাস্টারের বর্ণনায় ফুটে ওঠে। খরা, অনাবৃষ্টির ফলে লাঙল, বলদ বেঁচে লোকেরা দাদন শ্রমিক বোঝাই ট্রেনে চড়ে পাঞ্জাবে রওনা হয় কাজের তাগিদে। পাথরভাঙা, মাটি কাটার, ফসল মাড়াই-ঝাড়াই-এর কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে ঐ দক্ষিণ ও পশ্চিম অরণ্য মালভূমির সন্তানরা। একসময় এই উপত্যকা পৃথিবীর গহনতম অরণ্য ছিল আজ তা শুকিয়ে মহাপ্রান্তরে পরিণত হয়েছে। বর্তমানকালে মহাজনী শোষণ ছাড়াও ইংরেজ আমলে ও তার পূর্ববর্তী সময়ে দেশীয় রাজাদের লোভ-লালসা ও শোষণের গভীর ট্রাজিক ছবি ফুটে উঠেছে মার্গারিটাকে বলা নিখিল মাস্টারের বর্ণনায়-

> "সভ্যতা এনেছিল কয়লার ট্রেনগাড়ি, তার সঙ্গে এসেছে সিন্ধি, গুজরাতি, পাঞ্জাবি ঠিকেদার- তাদের লোভ উপড়ে, ভেঙে চূর্ণ করে চলে গেছে অরণ্যকে... পাখি আসে না আর, প্রজাপতিরা বৈরাগী, অজন্মায় দেশ-এই কলঙ্কের টিকা নিয়ে পড়ে আছে উপত্যকা।"[৬]

এই অঞ্চলের হালিয়ারা অতি দীন প্রকৃতির মানুষ। তারা ভূমিহীন। সামান্য কারণে, অকারণে এদের জীবন নির্বাহ করতে মহাজনের কাছে ধার করতে হয়, আর সেই আসল শোধ করতে পারে না তারা কখনই। এই সুদচক্র অনুসারে পৌষ পূর্ণিমায় যখন বড় মানুষ, মহাজনের ঘরে সরু চালের ধান ওঠে তখন হালিয়া সম্প্রদায়ের দীন মজুরেরা নিযুক্ত হয় কাজে আর ছাঁটাই হয় অন্য পৌষে। এই প্রসঙ্গে আরও জানা যায়-

> "গরীবের ধান ওঠে ভাদ্রে, তাদের নবান্ন ভাদ্র শুক্লার তৃতীয়া হইতে ত্রয়োদশী।"[৭]

চাষীদের থেকে ভূস্বামীরা বাইশ পুযি ধানের কড়ারে শ্রম কেনে আর সে অনুসারে সম্বৎসর সব কাজ করে কালঘাম ছুটে যায় গরীব চাষীদের। ভূমিহীনরাই এই উদন্তীর উপত্যকার সবচেয়ে সুখী মানুষ। কুসুমজোর কেন্দুমুণ্ডা, ভুলিয়াভাটা, নাঙ্গলকুড় অঞ্চলের ভূমিহীন চাষীদের জীবনচর্যার কাহিনী থেকেই ঐ অঞ্চলের বহুকৌণিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত হয় এ রূপে-

> "ঘরে গাই গরু নাই, জমি নাই, সেই জন্য ভাবনাচিন্তাও নাই। ভূমিহীনরা চিরসুখে বসবাস করে। তাই তারা সুখবাসী। ফাল্গুন হইতে সুখবাসীর ঘর খালি। অন্নাভাব। আগামীকাল ভাদ্র-নবান্নে মহাজনের লোক তাদের ধুতি গামছা দিবে এবং এক তৃতীয়াংশ টাকার আগাম, সেই টাকা ও সুদ পৌষ হইতে আবার শ্রমের হিসাবে জোড়া হইবে।"[৮]

উদন্তীর উৎস তারাঝের পাহাড় অঞ্চলে আকরিকের সাথে মিশে থাকা হিরের খোঁজে চোরাশিকারীরা দলে দলে আসে। তারা বহিরাগত তাই তাদের জীবনের দাম আছে, হিরে তোলার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নামিয়ে দেয় নাবালক, ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষীর ছেলে মেয়েদের। তাদের জীবনের মূল্য যেন মাটির ঢেলার চেয়েও সস্তা। আলোচ্য গল্পে কয়েক ঘর নিঃস্ব মানুষের কথাও বলেছেন লেখিকা। যাদের কাছে তৃষ্ণার জলটুকুও সহজলভ্য নয়। গরমের দিনে নদী শুকিয়ে গেলে বালিতে গর্ত খুঁড়ে জলে চুঁয়া বানাতে হয়। এই সমগ্র অবণ্য পার্বত্য ভূমি এন্ডেমিক ম্যালেরিয়ার মতো মারণ রোগের বিচরণ ভূমি। দশ বছরে ঐ প্রান্তিক এলাকার প্রায় পাঁচশোর ওপরে মানুষ মরেছে। এই সব কাহিনী একের পর এক বলতে বলতে নিখিল খেই হারিয়ে ফেলে। একসময় ১৯৭৫-এর আজন্মার রিলিফে ঘুরেছিল। পথের পাশে গরু আর মানুষের কঙ্কাল পড়ে থেকেছে। কেমন করে নিঃশব্দে শকুন একে একে নেমে আসে। খাজনা আদায়ের নামে সরকার-মালিকের তল্লাশি আর নিপীড়নের কথা মনের মধ্যে খোঁচা দিয়ে যায়। এই অতীত স্মৃতিচারণার মধ্যে পশু-পাখি ও মানুষের কঙ্কালময় অবস্থা, মহাজনী অত্যাচার এমনকি বনভূমি থেকে সেখানকার অরণ্যসমাজকে উচ্ছেদ করার বিবরণ, তাঁর কল্পনায় উঠে আসে। গল্পের শেষে নিখিল মাস্টারের মনে হয়েছে কার্থেজ নগরীর মতো এদেশে জীর্ণ অবস্থা, অসহায় মানুষের কথা কি মার্গারিটার লেখার মাধ্যমে ভিনদেশের লোক জানতে পারবে। তাই নিখিলের অপূর্ণ ইচ্ছা, যেমন সে চেয়েছিল অল্প অল্প করে এই অঞ্চলের কথা লিখে নথিভুক্ত করবে কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি, যা আজ মার্গারিটার কলমে পূর্ণতা পাবে। তাইতো মনের তলে তলে ভালো লাগা, ভবিষ্যত সম্ভাবনা, ঐ প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে লেখিকার ভাবালুতার প্রকাশ নিখিলের কণ্ঠে ধরা দিয়েছে-

> "কার্থেজ দেখেনি নিখিল। কিন্তু পৃথিবীর কোনো কোণে উজাড় বসতি যদি থেকে থাকে সর্বস্বান্ত মানুষের? তাকে দেখার জন্য পর্যটক আসবে কি ভিনদেশ থেকে?"[৯]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 133 - 140
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বহির্বাংলার বনাঞ্চল ও গ্রামগঞ্জের প্রান্তিক মানুষের কথাই শুধু নয়, শহরের পরিবেশের চাকচিক্যের বিপরীতে ঘিঞ্জি পল্লি, বস্তি অঞ্চলে প্রান্তিক ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির শোচনীয় জীবনের রূপ, করুণ কণ্ঠস্বর অনিতা অগ্নিহোত্রীর বেশ কিছু গল্পের কাহিনীতে স্থান পেয়েছে। এমনই একটি গল্প হল 'রৌদ্র' গল্পটি। গল্পের প্রেক্ষাপট চাঁদনিচকের ঘিঞ্জি বস্তি এলাকা। বড় রাস্তার উপর বাড়িতে একটি স্যাঁতস্যাঁতে ছোট ঘরে মুরশিদ-আয়েশার বাস। তাদের ছেলে আক্রাম যখন পাঁচ বছরের তখন সে ঘরের জানালা দিয়ে শেষ রোদ এসেছিল। পনেরো বছর পেরিয়ে গেছে বাড়ির পূব মুখের জানালা খোলেনি। আয়েশার বর মুরশিদ পুরনো ডায়াবেটিসের রোগী, হার্ট কমজোর, দু'পা অচল হয়ে বিছানায় শয্যাশায়ী। শহরের গলির এই ঘিঞ্জি পরিবেশে আয়েশাদের চিলতে বারান্দা ঘেঁষে ঘর, কমন পায়খানা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, রোদ বাতাস আসে না। সমাজের নিম্নস্থ এই খেটে খাওয়া মানুষের জীবনচিত্রটি এরূপ-

> "দিনের বেলাতেও কুপি জ্বালাতে হয়, বিজলি থাকে না, ছেলেটা বইখাতা দেখতে পায় না। মরদটার শরীর হেজে যাচ্ছে।"[১০]

আজ থেকে পনেরো বছর আগে স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন পুলিশের লোক এসে কাঠের তক্তা আর পেরেক মেরে এঁটে দিয়েছিল চাঁদনিচক এলাকার সাতশো বাইশখানা জানলা। সিকিউবিটির জন্য সাবধানতামূলক ব্যবস্থা নিতেই সেসময় এমনটা করা হয়। কেননা দেশের সবচেয়ে বড় মানুষ লালকিলায় খোলা আকাশের নীচে জনতাকে সম্বোধন করতে এলে এই আই লেভেলের সিকিউরিটির বন্দোবস্ত করা হয়। পরের দিন খুলে দেওয়া হয়েছিল বাকি জানলাগুলো কেবল আয়েশাদের জানলাটা তেমনই আঁটা রয়ে যায়। চাঁদনিচক থানার স্টেশন হাউস অফিসার জামসেদ, আয়েশার দীর্ঘদিনের আর্তি মানবিক দৃষ্টিতে দায়িত্ব নিয়ে সমাধান করার উদ্যোগ নিতে চাইলেও তা সাধারণ পুলিশের সাধ্যের বাইরের কার্য হয়ে যায়। কেননা জামশেদের উর্দি, চাকরি এমনকি মাথাও উবে যেতে পারে হাতের ইশারায়, কেননা সংখ্যালঘু হিসেবে সেও যে সর্বত্রই সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। সাধারণ পরিবারের অভিযোগ, আয়েশার দীর্ঘদিনের অনুনয়, বিনীত প্রার্থনা কোনটাই কার্যকর করতে পারেনি সামান্য পুলিশকর্মী। সেই নির্দেশে দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি নজর দিতে এসময় কিছু বাড়ি ও জানলা সিল করা হয় তা সরকারী কাজের গাফিলতিতে অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়া কাজকে নিজের প্রচেষ্টায় পূর্ণ করতে পারে না জামশেদ, কেননা-

> "সেই সব নির্দেশাবলী কার কলমে লেখা হয়েছিল? কালি-কলমে নয়, আঙুলের ইশারায়। যদি কোনও ফাইল দস্তাবেজ থেকেও থাকে তা জামশেদের নাগালের বাইরে।"[১১]

খেটে খাওয়া মানুষ, দিন মজুর, শ্রমিক, গলির রাস্তায় খাবার বেঁচে জীবন জীবিকা নির্বাহ করা এইসকল প্রান্তিক গরীব মানুষদের জীবনগুলি কীভাবে এমন অবহেলার, অগ্রাহ্যেই কেটে যায়, তাই দেখানো হয়েছে অনিতা অগ্নিহোত্রীর এই গল্পে। গল্পের শেষে দেখা যায় আয়েশা ছেলে আক্রাম বালকসুলভ কৌতূহল বসে কিছুটা আলোর তাগিদে টেস্ট পরীক্ষার পূর্বে অন্ধকার ঠেলে আলোর পথের দিশা নিজেই বের করে ফেলে হাথোড়া দিয়ে জানালা খুলে। এক দশক পর খোলা জানালার রোদ ঘরে এসে পড়লেও সেই রোদে যেন উষ্ণতা খুঁজে পায় না আয়েশা। তাঁর কেবলই মনে হয়-

> "কই তেমনি উষ্ণতা নেই তো এই রোদে, শীতল, যেমন মরা পশুর চামড়া একফালি। ... রৌদ্র-বঞ্চিত মুরশিদের মৃত্যুশোক ভলকে ভলকে উঠে আসে তার বুকের ভিতর এতদিন পর।"[১২]

অবহেলার শিকার হওয়া শহরের কোলে পড়ে থাকা প্রান্তিক জীবনের অসহায়তার প্রমাণ মেলে এই গল্পে।

'মনে পড়ে যাওয়া' গল্পটি স্মৃতিমেদুর এক আবেগাকুল বর্ণনার মাঝে প্রান্তিক অঞ্চলে অবস্থানরত এক মায়ের নিতান্ত অসহায়তার দিকটি দেখানো হয়েছে। যেখানে পেটের দায়ে, অভাবে-অনাহারে এক মাকে বলি দিতে হয়েছে তার সর্বস্ব। ছেলে বালুর স্মৃতির মজ্জায় শিহরণ জাগিয়ে তোলে বাল্যস্মৃতি, আর আমরা অবগত হই কীভাবে চাষী পরিবারের, দিনমজুর, খেটে খাওয়া মানুষেরা দেশে কাজ না পেয়ে বিদেশে ঠিকেদারের কাজে চালান হয় আর মেয়ে-বউদের শ্রমের পাশাপাশি শরীরও বলি দিতে হয় মহাজনদের কাছে। গল্প কাহিনীর শুরুতেই দেখা যায় মাথানি গাঁয়ের মোড়ে ট্রাক বোঝাই করে মেয়ে-পুরুষ সব ভিনরাজ্যে চালান হচ্ছে কাজের তাগিদে। বালুর মা হুড়মুড় করে উঠতে পারছে না, শেষে ছোট বালু একটু দূর থেকে তাকিয়ে দেখতে পায় একটা হাত তার মাকে ট্রেনে তুলে নিলো। তারপর ধুলো উড়িয়ে ট্রাক চলতে শুরু

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 133 - 140
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করলো, মাটি দুলে উঠল, গতিবেগ ক্রমাগত বেড়েই চলল, চোখের নিমেষে মা বহুদূরে গমন করলেন। বালু তখন এতটাই ছোট যে অত উঁচুতে মায়ের পিছন ফিরে তাকিয়ে ছোট্ট ছেলেকে হাত নেড়ে বিদায় জানানোর শেষ প্রয়াসটাও বৃথা যায়। বালু হৃদয়মথিত হতে থাকে আর বারবারই শুধু মনে হয়-

"মা চলে গেল ঠিকাদারের জন্য কাজ করতে। ভিনদেশে। সেখান থেকে টাকা পাঠাবে।"[১৩]

গ্রামে ফিরে এসে বালুর একাকিত্ববোধ আরও তীব্রতর হয়। মা ছাড়া ঘরকে তার আর ঘর বলে মনে হল না। বাবা আছেন বিছানায় শয্যাশায়ী। দু বছর হল অসুস্থ, কাজ পায় না। পা ফুলে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে আছে। আধপেটা খেয়ে, একবেলা অনাহারে কাটিয়ে সংসার চলা দায় দেখে বালুর মা'কে বাধ্য হয়ে বাইরে কাজের জন্য যেতে হয়েছে। এই ভাবে খাওয়া, না-খাওয়া, আধখাওয়া করতে করতে একরাতে বালুর বাবা মরে গেলে ছোট্ট বালু একদম অনাথ হয়ে পড়ে। বিরজন সাহুকারের বাড়িতে তখন থেকে বালু প্রথমে পেট ভাতায়, তারপর টাকার মজদুরিতে কাজে লেগে পড়ে। একটি ফুটফুটে বালকসুলভ সত্তাব এমন নির্মম পরিণতি প্রান্তিক জীবনের প্রেক্ষাপটে গল্পে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে তুলে ধরেছেন লেখিকা। দীর্ঘদিন কেটে যেতে থাকে, বালুর হাত-পা শক্ত হয়ে, মাথায় বেড়ে আজ অনেক বড় সড় হয়েছে। পরনে তার জিনস্ প্যান্ট, লালগেঞ্জি, হাতে কড়া। আজ সে নিজেই ঠিকাদারের লোক। সময়ের নিয়মে দিন পেরিয়ে গেলেও মাথানি গাঁয়ের নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক জীবনে, হরিজন পল্লিতে আজও মে-বউ বাইরে চালান হয়। ঠিক যেমন একসময় বালুর মাকে বলি দিতে হয়েছিল সংসারের জন্য নিজের সর্বস্ব। আজ বহু বছর পরে স্মৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে মাকে এনে বালু বর্তমান থেকে অতীতে ধাবিত হয়। যখন মাথানি গাঁয়ের মোড়ে এবছর আবারও খরার মাসে ট্রাক এসে থামতেই মেয়ে মরদের হুড়োহুড়ি শুরু হয়। বালু মনে মনে ভাবে-

"চেটেপুটে নিয়ে যাবে ঠিকেদার। ভিনদেশে লোক নেই। মজুরি বেশি।"[১৪]

বৃথাই হুড়োহুড়ি, পারাপারি। হঠাৎই একটি রোগামতো বউকে উঠতে না পারা অবস্থায় দেখে বালু যেন তার ছোটবেলার ঐ দিনটিতে পৌঁছে যায়, যেদিন একইভাবে তার মা'ও ভিনদেশে যাওয়ার জন্য ট্রাকে উঠতে পারছিল না। মা চলে যাবার দিনের ধুলো ওড়া স্মৃতির সাথে সব যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। ভিনদেশে কাজে যাওয়ার সাথে সাথে সব রহস্যের উন্মোচন ঘটে যায় বালুর অন্তরে। সে বুঝতে পারে তার মায়ের ভবিতব্য কি ছিল। বালু গল্পোক্ত ঐ মহিলাকে পিছন থেকে ধরে ট্রাকে তুলে দিতেই-

> "বালুর নাকে ধাঁ করে ঢুকে গেল তার লালচে ময়লা চুলের ধুলোট গন্ধ, আ-কাচা শাড়ির বাস, খিদের ঘ্রাণ তার সারা গায়ে। আর তক্ষুনি সব মনে পড়ে গেল বালুর। সমস্ত কিছু।"[১৫]

অসহায়, খেটে খাওয়া মানুষের রোজগারের জন্য মহাজনের লোভের শিকার হয়ে নিজের আমিত্বের বলি দেওয়ার মতো বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে আলোচ্য গল্পে।

বানভাসি ছিন্নমূল মানুষের কথা, প্রান্তিক জীবনের নির্মম অসহায়তার কথা 'প্লাবনজল' গল্পে জায়গা করে নিয়েছে। নদী বাঁধের জন্য সরকারি জমি অধিগ্রহণের ফলে গ্রামের সুবিধাভোগী, অবস্থাপন্ন শ্রেণীর পৌষমাস আর গরীব চাষিদের জীবনে সর্বনাশের আবহ তৈরী হয়। শোনপুর গ্রামের গুণ সাহুর মেয়ে বনমালা বন্ধরা গ্রামের জগদীশ মহান্তি নামের বড়, অবস্থাপন্ন গৃহস্থ পরিবারে বিয়ে হয়ে আসে। জগদীশের বি.এ পাশ করা সুপুত্র ছিন্নমূল বানভাসি মানুষদের পাশে থেকে বাঁধ-বিরোধী সমিতির একজন হয়েছে। অপরদিকে, প্রতিপত্তিশালী জগদীশ চেয়েছে পুত্রবধূ বনমালার কোলে যে নাতি আসছে তার ভবিষ্যৎ কল্পনা করে আরও বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি করতে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন মিলিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতাতে। কিন্তু তাতে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় নিজেরই ছেলে। জগদীশের ছেলে গ্রামবাসীদের জানায়-

"ক্ষতিপূরণ নিয়ো না, জমি দিয়ো না, বাঁধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও।"[১৬]

কিন্তু গ্রামে সব বড় চাষী গৃহস্থকে এক করে জমির ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে দিলে বাকি লোকেরা সুড়সুড়িয়ে রাজি হয়ে যায়। কাঁচা টাকার লোভ বড় বেশি। কঙ্করা গ্রামের প্রান্তিক অঞ্চলে বাস খেতমজুর, মুণ্ডা-বাগদি ঘাসি সম্প্রদায়ের লোকেদের। এদের জমি থেকে উৎখাত করলেও তেমন কোন শিকড়ের টান নেই এদের। এদের সম্বল তো যৎসামান্য। কোন নির্দিষ্ট চালচুলো, একফালি জমি জায়গা তো নেই। স্রোতের শ্যাওলার মতো এদের গতিবিধি এ-গাঁয়ের জমি ডুবলে, অন্য গাঁয়ে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 133 - 140
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গিয়ে দিনমজুরী করে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। এইসব লোককে উপর মহলের মহাজন, ভূস্বামীরা একটু মদ-মাংস খাইয়ে রাজি করিয়ে ফেলে। গ্রামে বাঁধের কাজ শুরু হলে সুবিধাভোগী শ্রেণী অর্থ পেয়ে নিজেদের প্রতিপত্তি আরও দিনে দিনে বাড়াবে। আর সুজলা-সুফলা সোনার ফসল ফলানো কঙ্কনা গ্রামের বিপুল জলভাণ্ডারে বাঁধ দিয়ে শুষ্ক করে তুলবে। জল বয়ে যাবে কঙ্করা, কুটেন, সিলেট, পাথুরিপল্লি, জাগিয়ারার মতো জনপদ ডুবিয়ে দিয়ে। নদীর বিপুল জলভাণ্ডারে বাঁধ দিয়ে, দীর্ঘ ক্যানেল কাটার ফলে সুবিধাভোগী শ্রেণীর লাভ হলেও, কঙ্করা গ্রামের প্রান্তিক অঞ্চলের গরিব চাষী ও খেটে খাওয়া মানুষের জীবনে নেমে আসবে বিপর্যয়। তাদের সোনার ফসল ফলানো চাষের জমি, বসতবাড়ি ডুবে যাবে জলে। মিথ্যা লাভের আশা দিয়ে গরিব মানুষের সাথে ছলনা করায় জগদীশের ছেলে রাতে একা শুয়ে বনমালাকে সব খোলসা করে বলেছে-

> "সব মিছে, ওইসব খরা শুখার গল্প। আমরা তো এই খরার দেশে এত পুরুষ ধরে ফসল কলিয়েছি, ধান ফলাচ্ছি, সবজি চাষ করছি, আমাদের ফসল ডুবিয়ে আরও পাঁচটা গ্রামে জল পৌঁছানোর মানে কী?"[১৭]

যবে থেকে বাঁধের জন্য জমি নেওয়া হয়ে যায় গ্রামের শ্রী যেন হারিয়ে যায়। রাস্তাঘাট মেরামত হয় না আর। বন্ধ্যা অঞ্চল হয়ে পড়ে থাকে সমগ্র এলাকা, সরকার গ্রামের উন্নয়নে হাত লাগায় না, গৃহস্থ ঘরের লোকেরাও হাত লাগাবে না, দুহাত তুলে বসে পড়েছে প্রত্যেকেই। কেননা গ্রাম তলিয়ে গেলে সবই হাতছাড়া হয়ে যাবে। কি হবে সব আগলে রেখে, যেখানে-

> "নিজেদের ঘরের চাল পচে যাচ্ছে, খড় ছাইবে না- কী হবে, এই তো গাঁ ডুবল বলে। ঘটিবাটি ফুটো, নতুন কিনবে না-কী হবে, সব তুলে তো বাস আবার ওঠাতেই হবে!"[১৮]

গল্পে ভূমিহীন, গৃহহীন, বানভাসি মানুষদের বর্ণনা বনমালার অতীত স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে উঠে আসে। অবস্থাপন্ন জগদীশের ছেলের সাথে বনমালা বিবাহ করে এসেও স্বপ্ন যেন তাদের অধরাই থেকে যায়। প্রাগুক্ত সমস্যার কথা বনমালার মানসপটে জাগরিত হতেই বনমালা অতীতের দিনগুলির কথায় ফিরে যায়। যেখানে অর্থের কাছে, লোভের কাছে একসময় গ্রামবাসীদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তার স্বামীকে বলি হতে হয়েছিল। জমি অধিগ্রহণের টাকা পাওয়ার দিন রাতে কতিপয় জনতাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বনমালার স্বামীও নিরুদ্দেশ হয়ে গেল তাদের জীবন থেকে। আজ ন্যুব্জ শ্বশুর, ননদ টুকি ও কোলের সন্তান শান্তনুকে ঘিরে নতুন বসত উঠেছে রাজগ্রামে, তবে প্রান্তিক বানভাসি জীবনের আড়ালে এক নারী জীবনের আর্তি, স্বামীর প্রতি গভীর মমত্ববোধের ইঙ্গিত, না পাওয়ার বেদনা খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা গল্প শেষের বর্ণনায়-

> "ওই জলের তলায় একটা মানুষের একলা কঙ্কাল রয়ে গেল নাকি? সে তো বনমালাকে সঙ্গে নিয়েই ডুবে থাকতে চেয়েছিল- কিন্তু তার আগেই শান্তনু এসেছে বনমালা আর ডুবতে সাহস করল কই? মায়েদের সে ভেসে থাকতে হয়- কত কষ্টে!"[১৯]

ভূমিহীনরা এক গাঁ ছেড়ে অন্য গাঁয়ে স্বাভাবিক নিয়মেই কাজে কর্মে লেগে পড়লেও গ্রাম ছেড়ে, বাস্তুভিটে ছেড়ে বনমালাদের মতো পরিবারগুলি শোষণ বঞ্চনার শিকার হয়। মানুষের জন্য ভেবে ঘুরে বেড়িয়ে মিটিং-মিছিল-সভা করে বনমালার স্বামী অঘোরে প্রাণ হারায়। প্রান্তিক জীবনের এমন অসহায়তা, নির্মমতার চিত্র অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে গল্পে তুলে ধরেছেন।

প্রান্তিক কৃষিজীবী, দিনমজুর, দলিত আদিবাসী জনসমাজ স্বাধীনতার এতকাল পরেও যাদের অভাব-অভিযোগগুলি ঠিক জায়গা পর্যন্ত পৌছাতে পারেনি, অনিতা অগ্নিহোত্রীর কলমে উঠে এসেছে সেই সব অনুচ্চারিত কথা। কলকাতা শহর ছাড়ার পর তিন দশকেরও বেশী সময় কেটেছে তাঁর সেই প্রান্তিক জনজীবনের সান্নিধ্যে। গ্রামগঞ্জে ঘুরে মানুষের সমস্যা দেখে চুপ থাকা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। তাই এই বাস্তুচ্যুতদের নিয়ে চিন্তাশীল গদ্যে, আবার কখনও সরল গদ্যশৈলীতে লিখেছেন একের পর এক গল্প। উড়িষ্যা, সম্বল, ছত্রিশগড়ের মালভূমি কিংবা মহানদীর অববাহিকা অঞ্চলের জনজাতির স্নেহপরায়ণ মানুষের জীবনযাত্রার বহুমাত্রিক কথন লেখিকার গল্পে জায়গা করে নিয়েছে। গল্পের জগতে এসেছে বঙ্গবহির্ভূত মানুষের কথা। তাদের হারিয়ে যাওয়া জনপদ, নদী-অরণ্য-দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার কথা, প্রান্তিক নিম্নবর্গীয় মানুষ, তাদের আচার-আচরণ, সংস্কৃতির আলেখ্যই প্রধান হয়ে উঠেছে অনিতা অগ্নিহোত্রীর গল্পে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 15
Website: https://tirj.org.in, Page No. 133 - 140
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. সিংহ, পুরুষোত্তম : ‘কথাবয়ণ’, অনিতা অগ্নিহোত্রী সংখ্যা, ৩য় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ২০১৯, পৃ. ৮৫

২. অগ্নিহোত্রী, অনিতা : ‘শ্রেষ্ঠগল্প’, করুণা প্রকাশনী, ১৮-এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯, দ্বিতীয় সংস্করণ: সেপ্টেম্বর, ২০১৮, পৃ. ১৪৮

৩. তদেব, পৃ. ১৪৮

৪. তদেব, পৃ. ১৪৭

৫. তদেব, পৃ. ১৪৯

৬. তদেব, পৃ. ২৫২

৭. তদেব, পৃ. ২৫২

৮. তদেব, পৃ. ২৫৩

৯. তদেব, পৃ. ২৫৪

১০. অগ্নিহোত্রী, অনিতা : ‘সেরা ৫০টি গল্প’, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-মাঘ ১৪২৪, পৃ. ৩৫৮

১১. তদেব, পৃ. ৩৫৮

১২. তদেব, পৃ. ৩৬০

১৩. তদেব, পৃ. ৩৬১

১৪. তদেব, পৃ. ৩৬২

১৫. তদেব, পৃ. ৩৬২

১৬. তদেব, পৃ. ২৩৬

১৭. তদেব, পৃ. ২৩৬

১৮. তদেব, পৃ. ২৩৮

১৯. তদেব, পৃ. ২৩৯